মডিউল-৩০

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-14

কোর্স নাম - সংস্কৃত, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ও লোকসাহিত্য

মিলন মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ বিষয় কালিদাস্যের কাব্য

বিন্যাসক্রম

৩০.১ উদ্দেশ্য

৩০.২ প্রস্তাবনা

৩০.৩ কালিদাসের সময়কাল।

৩০.৪ কালিদাসের কাব্যগুলির উৎস ও পরিচয়।

৩০.৫ কাব্যগুলির কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ক) কুমারসম্ভব

খ) রঘুবংশ

গ) মেঘদূত

ঘ) ঋতু সংহার

৩০.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০.৮ উত্তর সংকেত

৩০.১ উদ্দেশ্য

● সুদূর অতীতের অন্ধকার লোক থেকে যে জ্যোতি সমগ্র ভারতের কবিমানসকে কবি কালিদাস কীভাবে আলোকিত করেছেন, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ করবে।

● সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে কালিদাসের অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে,.।

● কালিদাসের পূর্ব ও পরবর্তী কবিদের সম্পর্কে জানতে পারবে।

● কালিদাসের রচিত কাব্যগুলির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবে।

● সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যগুলির প্রভাব কতখানি সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

● কালিদাস পরবর্তী সময়ে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির উপর কালিদাসের কাব্যগুলির প্রভাব কতখানি পড়েছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

● কালিদাস রচিত কাব্যগুলির শব্দ, ভাষা প্রয়োগের বৈচিত্র সম্পর্কে অবগত হবে।

৩০.২ প্রস্তাবনা

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে কালিদাস পিতৃকুলপতি রূপে বিরাজ করেছেন। ভারতীয় কাব্যকুঞ্জে তিনি অন্ত্রগণ্য পথ প্রদর্শক। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে কালিদাস অগ্রগণ্য। প্রেম সৌন্দর্যও কল্যাণময় দীপ্ত প্রকাশে কালিদাস সকলের চেয়ে ভীন্ন। এক নতুন জীবনাদর্শের স্রষ্টা রূপে কালিদাস জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যগুলি পুরান থেকে যেমন কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন তেমনি কিছু মৌলক চিন্তা ভারনার ও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ মহাকাব্যগুলি পুরানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'মেঘদূত' ও ঋতুসংহার তার নিজস্ব মৌলিকতা ছাপ রেখেছে। এই আলোচনায় কালিদাসের রচিত কাব্যগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোক পাত করা হবে।

২৯.৩ কালিদাসের সময়কাল

কালিদাসের সময়কাল নিয়ে নানা আলোচনা ও মতামত প্রচলিত আছে। কেউ বলে কালিদাস খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কালিদাসের কাব্যে ভাস্বের নাম উল্লেখ করেছেন। আবার তাঁর কাব্যে অশ্বঘোষের রচনার প্রভাব রয়েছে। কাজেই কালিদাস ভাস ও অশ্বঘোষের পরবর্তীকালের কবি। অতএব কালিদাসের কালকে কোনোমতেই দ্বিতীয় শতকের পর্বে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কালিদাসের আবির্ভাব কাল নিয়ে তৃতীয় মতটি ফার্গুসনের। তাঁর মতে, কালিদাসের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দী। তিনি মনে করেন, মালব রাজা যশোবর্মণের সমসাময়িক হলেন কালিদাস। কারণ– (ক) ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির কালিদাসের সঙ্গে নবরত্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ফার্গুসনের মতকে খণ্ডন করেন ফ্লীট ও ম্যাকডোনেল। কালিদাস সম্পর্কিত সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এ বী কীথ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাইই সকলে গ্রহণ করেচেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম সমৃদ্ধির যুগে কালিদাসের আবির্ভাব সম্ভব। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৩ খ্রী) 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন এবং রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্যেরই রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ঐতিহ্যের সঙ্গে ইতিহাসেরও একাত্মতা জন্মে। কালিদাস কুমারাদিত্যের পর তাঁর পুত্র স্কন্ধেগুপ্তের (৪৫৫-৪৬৭ খ্রী:) রাজত্বকালেও বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তারপরে কখনোই নয়। এ বিষয়ে এ. বী কীথের অভিমতটি হল– ''Kalidas then lived before A. D. 472 and probably at a considerable distance, so that to place him about A.D. 400'' তাই মতকেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। তাইতো রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছিলেন–

''হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল পণ্ডিতরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।''

তাই সকল বিচার বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল কবিকে নিয়ে নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের রসেই আকণ্ঠ তৃপ্ত থাকার বাসনা প্রকাশ করতে হবে।

৩০.৪ কালিদাসের কাব্যগুলির উৎস ও পরিচয়

বমহাকাব্য : কুমারসম্ভব

সংস্কৃত সাহিত্য জগতকে কালিদাস দু'টি মহাকাব্য উপহার দিয়েছেন এক কুমারসম্ভব, দুই রঘুবংশম প্রথমটি কবির তরুণ বয়সের এবং দ্বিতীয়টি কবির পরিণত বয়সের রচনা।

'কুমারসম্ভব' সপ্তদশ সর্গে রচিত মহাকাব্য সমালোচকদের মতে এই মহাকাব্যের সপ্তমসর্গে কুমার কার্তিকেয়ের জনম সম্ভব সূচিত হয়েছে বোধ করি এ কারণেই অনেকের মতে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের রচনা। অবশিষ্ট সর্গগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন এবং এই অংশের রচনারীতি কালিদাসের রচনার সাদৃশ্যবাহীও নয়। কেন না পরবর্তী সর্গগুলিতে পার্বতী-পরমেশ্বরের যে সম্ভোগচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা কালিদাসের কবিমানসিকতার পরিপন্থী।

উৎস

কুমারসম্ভবের কাহিনী মৌলিক নয়। শিব-পার্বতীর মূল কাহিনীটি আমরা রামায়ণ, মহাভারত এবং মৎস্য, ব্রহ্ম কালিকা, সৌর, শিব প্রভৃতি একাধিক পুরানে উল্লেখ পাই। মহাভারতের বর্ণপর্বে শিব এবং পার্বতীর কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য রামায়ণ মহাভারতে যে কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তার সঙ্গে কালিদাস বর্ণিত কাহিনীর পার্থক্য লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে কালিদাস 'শিবপুরাণ'-এর কাছে অনেকাংশেই ঋণী। কুমারসম্ভবের বহু শ্লোক শিবপুরাণের যথাযথ অনুকৃতি। প্রাচীন সাহিত্য থেকে 'কুমারসম্ভব'-এর কাহিনী মহাকবি গ্রহণ করলেও কবির সাহিত্যগুণে তা সম্পূর্ণ অভিনবত্ব লাভ করেছে। এখানেই মহাকবির শ্রেষ্ট।

কাহিনী সার : পিতা-দক্ষ, কন্যা-সতী

পিতা দক্ষের মুখে স্বামী শিবের নিন্দা গুনে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণ ত্যাগ করেন। এবং পরজন্মে তিনি মেনকার গর্ভে হিমালয়ের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নাম হয় উমা বা পার্বতী। কন্যা যৌবনাবতী হলে দেবর্ষি নারদ এসে হিমালয়কে জানালেন যে তাঁর কন্যা এ জন্মেও মহাদেবকেই পতিরূপে বরণ করবেন।

ইতিমধ্যে হিমালয় জানতে পারেন, স্বয়ং মহাদেব তপস্যার জন্য হিমাচল প্রদেশে এসেছেন। একথা জানার পর হিমালয় দুই সখীসহ পার্বতীকে তার পরিচর্যার ভার গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এই সময় স্বর্গরাজ্যে তারকাসুরের অত্যাচারে অধীর হয়ে ওঠেন দেবতারা, অতিষ্ঠ দেবতারা তাদের সমস্যার কথা ব্রহ্মার কাছে উত্থাপন করেন। ব্রহ্মা জানালেন তপস্যারত শিব যাতে সেবারতা পার্বতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন তার ব্যবস্থা করতে। তাদের মিলনে যে কুমার সম্ভব হবে সেই দেবসেনা পতি হয়ে তারকাসুর সংহার করবে।

অতপর মহাদেবকে পার্বতীর প্রতি আকৃষ্ঠ করতে উপায় সন্ধানে ব্রতী হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র প্রেমের দেবতা মদনকে আহ্বান জানালেন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করতে। মদনদেব তার সঙ্গে নিয়ে এলেন পত্নী রতি ও সহচর বসন্তকে। তপোবনে অসময়ে বসন্তের সমাগমও হল। প্রকৃতিতে জাগল

বসন্তের উন্মাদনা, তির্যক প্রাণীরাও মনে প্রাণে-দেহে বসন্তের সাড়া অনুভব করতে থাকল। পার্বতী মহাদেবের সামনে পূজা দিতে গেলে কামদেবের প্রভাবে ধ্যানমগ্ন যোগী কিছুটা চঞ্চল হলেন, তার অন্তর কামনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সামনে তাকাতেই লতাকুঞ্জের আড়ালে দেখতে পেলেন পুষ্পধনু হাতে মদনকে। মদনের ছলনায় ক্রুব্ধ শিবের তৃতীয় নয়ন জ্বলে উঠলে মদনদেব ভস্মীভূত হল। মহাদেব পদপ্রান্তে উপবিষ্টা পার্বতীকে উপেক্ষা করে স্থানন্তরে চলে গেলেন। ফল হল দুটি। স্বামী বিরহে কাতর রতি অগ্নি প্রজ্বলিত করে আত্মাহূতি দিতে উদ্যত হলেন। এমন সময় সহসা আকাশ থেকে দৈববাণী হলে জানা যায় যে শিব ও পার্বতীর বিবাহ হলে শিবের বরে কামদেব প্রাণ ফিরে পাবেন। আশ্বস্ত হন রতি। তিনি আত্মবিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ করেন।

অন্যদিকে পার্বতী মহাদেবের যথোচিত তুষ্টি বিধানে অক্ষম হয়ে পুনরায় তাঁর সষ্টির জন্য পিতামাতার অনুমতি নিয়ে নিভৃত গিরি শিখরে গিয়ে কঠোর তপস্যা ব্রতী হলেন। পার্বতীর তপস্যায় প্রীত হবে মহাদেব তাঁর নিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য তরুণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কিন্তু অপর্ণার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মহাদেব নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না। তিনি আত্মপ্রকাশ করে পার্বতীকে স্ত্রী রূপে কামনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গরা, অত্রি, বশিষ্ট প্রমুখ সপ্তর্ষি এসে হিমালয়ের কাছে শিব-পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব দেন। হিমালয় ও সেই প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করেন। এবং নির্দিষ্ট দিনে মহাদেব বাঘছাল পরে, ষাঁড়ে চড়ে, অষ্টমাতৃকা মহাকালী ও প্রমথগণসহ উপস্থিত হন বিবাহ সভায়। যথা সময়ে বিবাহ পর্ব সমাপন হয়। বিবাহের বর-বধূ কৈলাসে ফেরেন। কৈলাসে ফিরে নবদম্পতি বেশ কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা করেন। একদিন উভয়ে যখন গিরিগুহায় রতিসুখে মগ্ন তখন হঠাৎই অগ্নির আগমনে সচকিত শিবের তেজঃমহমা স্খলিত হয়। পার্বতী তা ধারণ করে অসমর্থ হয়ে শিবশক্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি দেবতা তা সহ্য করতে না পেরে জলে নিক্ষেপ করেন। সেই জল পান করে কৃত্তিকাগণ গর্ভবতী হন এবং ছয়জন কৃত্তিকা একটি শিশু সন্তানের জন্ম হয়। কৃত্তিকাদের সন্তান বলে শিশুটির নাম রাখা হয় কার্তিকেয়। এই কার্তিকেয়ই দেব সেনাপতি রূপে যুদ্ধ করে তারকাসুরকে বধ করেন। তারকাসুর নিধনে স্বর্গরাজ্যে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে।

কাব্যস্বরূপ

কুমারসম্ভব কালিদাসের প্রথম কাব্য। প্রথম কাব্য হলেও নিজস্ব কবি বৈশিষ্ট্যে অপরূপতা লাভ করছে। প্রাচীন শিবপুরাণ বা স্কন্দপুরাণ থেকে এ কাহিনীর সূত্র গ্রহণ করে থাকতে পারেন। কিন্তু ঠিক কোন কাব্য থেকে কতটা গ্রহণ করেছেন তা বোঝা দুষ্কর। কেননা ঐ সূত্র অবলম্বনে যা বয়ন করে তোলা হয়েছে সেখানে কবির নির্মাণ ক্ষমা প্রভাব অলৌকিক মহিমা বিরাজ করেছে। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য শাশ্বত ভারতীয়ত্ব। যে প্রেম সম্ভোগের মধ্যে স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে উঠতে চায় তা দেব রোষে, ঋষি ভস্মীভূত হয়। এই কাব্যে পার্বতী আত্মরূপ ধিক্কার দিয়েছেন। সাধনার মাধ্যমে জয় করেছেন প্রিয়তমর অন্তর আত্মা 'কুমারসম্ভব'-এ সৌন্দর্য বর্ণনার নানারূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিটি সর্গ সৌন্দর্য স্বকীয়তায় বিভাষিত। এ কাব্যের তৃতীয় সর্গ অকাল বসন্তের বর্ণনা, চতুর্থ সর্গ বাত বিলাপে স্বামী বিরহে পত্নীর বেদনা বিহ্বলতায়, পঞ্চম সর্গ পার্বতীর তপশ্চর্যার রুক্ষতা ও দৃঢ়তার এক রূপসৌন্দর্য আমাদের সৌন্দর্য

চেতনাকে উৎসারিত করে।

সৌন্দর্য নির্মাণ বর্ণনার পাশাপাশি চরিত্র নির্মাণেও মহাকবি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। এখানে কোনো মানব চরিত্র নেই, এর নায়ক-নায়িকা দেব-দেবী। পর্বত, পর্বত মহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মদন, রতি-প্রমুখ কেউই প্রকৃত গার্হস্থ্য মানব-মানবী নয়! কিন্তু কালিদাসের কবিত্ব শক্তির প্রভাবে তারা সকলেই মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ নিয়ে রক্ত-মাংসের মানবীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। সর্বোপরি কন্যার জন্ম শৈশব যৌবনোগম, বিবাহ এবং পিতা মাতার কর্তব্য ইত্যাদি ঘরোয়া জীবনের চিত্রের ছায়াছবিতে এ কাব্য পরিপূর্ণ। অধ্যাপক সুকুমার সেন কুমারসম্ভবে বিবাহপূর্ব অনুরাগের বিবরণ দাম্পত্য প্রেমের বর্ণনা রীতিতে আধুনিক কালের স্পর্শ লক্ষ করেছেন।

মূল্যায়ন

সতেরো সর্গে বিন্যস্ত ‘কুমারসম্ভব’ কালিদাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। অবশ্য অষ্টম সর্গ পর্যন্ত কালিদাস রচিত বলে সমালোকগণ মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সপ্তম সর্গেই কালিদাসের কাব্যটি সমাপ্ত। কুমারসম্ভব কাব্যের শেষের সর্গগুলিতে অশ্লিলতার বাড়াবাড়ি জন্য অনেকে মনে করেন এগুলি কালিদাসের রচিত নয়। তাঁদের যুক্তি রুচিশীল কবির পক্ষে এ ধরনের অশ্লীলতার ছবি কবি রুচির পরিপন্থী। কিন্তু তা হলেও আমরা মনে করি জীবনমুখী কালিদাসের কাব্যে শ্লিল-অশ্লিল দুই-ই বাস্তব। কেননা তার কাছে জীবনরস পূর্ণমাত্রায় উপভোগ্য ছিল বলেই অভিজ্ঞান শকুন্তলম, কুমারসম্ভব ও মেঘদূতের মত অমর রচনা সম্ভারে স্রষ্টা হতে পেরেছিলেন।

জীবন শুধু ত্যাগের মহিমা প্রচার নয় ভোগের রক্তিমতারও জীবনে অবশ্যক। ভোগ থেকেই তো ত্যাগের পূর্ণতা। ভোগও ত্যাগেই জীবনের পূর্ণতা। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ক্ষুধা জীবনকেই তাড়িত করে। কালিদাসকেও যে তা তাড়িত করে ছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের। অবকাশ নেই। সুখ-স্বাচ্ছন্দই যে ভোগের পথকে প্রশস্ত করে তা আমাদেরেই সকলকেই জানা। সামাজিক এই বোধ-বিষয়ই মহাকবিকে বন্ধধারী সন্ন্যাসীর গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়েছে-যা তার নাটক কাব্যে স্পস্ষ্ট। এই রসবোধ কাবির হর-পার্বতীর-রতিক্রিয়া দৃশ্যে বর্ণিত। দেহবাসনা ও রতিক্রিয়া বিষয় কুমারসম্ভবকাব্যে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিষয় নয়, বরং স্বতস্ফূর্তিঃ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য পরিণতির ফল। রাগ অনুরাগ-অভিসার-বিরহ-ভাবসম্মিলন; সুখ দুঃখ তপস্যার সাধনার পরম প্রেয়কে শ্রেয়রূপে লাভ করা যায়। বোধ করি এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন–

> ‘‘দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে, সে মিলন অসম্পন্ন হইয়া আপনার বিচিত্র কারুখচিত পরম সুন্দর বাসর শয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ। তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাকরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরল নির্মল বেশে কল্যাণের শুভদীপ্তিতে কর্মন্যয় হইয়া উঠিয়াছে।’’

কাব্যের শেষে এই প্রেয় বোধের আদর্শই মিলন কল্যাণের শুভ্রদীপ্তিতে রমণীয় হয়ে। উঠেছে। আর এর সূচনাপর্ব মদনে। এই মিলনে কামদেব থাকলেও তিনি জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন। জীবনধর্মকে

অস্বীকার করে কখনোই প্রেমের কাব্য লেখা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই মহাকবি জীবনরসামৃত পান করেই কুমারসম্ভব কাব্যে জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন মহাকবি কালিদাস। যথার্থ চরিত্র-চিত্রণ কুশলতার ও পরিবেশ রূপ চিত্রণে কুমারসম্ভব কাব্যের কাহিনী ধারা ঘনসংরাগপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মহাকবি যথার্থ জীবনরসিকের দৃষ্টি দিয়ে উমা ও মেহেশ্বরকে গড়ে তুলেছেন। উমার জীবন পর্বেও আমরা শকুন্তলারূপ দুটি পর্ব প্রত্যক্ষ করি। একটি পর্বে যৌবনের মক্ততা ও উল্লাস, অপরটিতে কঠোর সাধনার সংযম ও বোধ। ফলকথা ত্যাগ ও ভোগের দুই স্রোতোস্বিনীকে মহাকবি একাই জীবনখাতে প্রবাহিত করেছেন। প্রকৃত প্রেম যে মঙ্গল-চেতনার মধ্যে পূর্ণতা পায় তা জন্ম সম্ভবনার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। বোধ করি এ কারণেই শেষ পর্যন্ত এ কাব্যে কঠোর তপস্বী মহেশ্বরকেও উমা পাণিপ্রার্থী হয়েছেন। কখনো সখনো কঠোর তপশ্চর্যায় ভগবানও যে ভক্তের কাছে হার স্বীকার করেন তার যথাযথ দৃষ্টান্ত অপর্ণা। সংযমের যে প্রতিমূর্তি তৃতীয় নয়নের অগ্নি দাহে মদনকে ভস্মীভূত হতে হয় সেই শিবই আবার অপর্ণার গুণমুগ্ধ হয়ে বাধ্য হন নিজ ছদ্মবেশটি খুলে ফেলতে অবশেষে পুরুষ ও প্রকৃতির শুমিলনে শুভ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাব্যে উমা-মহেশ্বরের মিলনে আসলে যথার্থ মঙ্গলের বীজটি প্রথিত হয়েছে।

কালিদাসের কাব্য কাহিনী মূলত চিত্রাশ্রয়ী ফলে কাব্যে কাহিনী অংশ গৌণ হয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে চিত্ররস। ধ্যান মগ্ন নাগাধীরাজ-এর যে ছবি কালিদাসের কলমে চিত্রিত হয়েছে তার সমুন্নত রূপ বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে তিনি পর্বতের যে ছবি অঙ্কন করেছেন তার বর্ণময়তা চিরকালের পঠককুলকে মুগ্ধ করে।

ভগীরথী-নির্ঝরশীকরানাং বোঢ়া মুহুঃকপিত-দেবদারু
যদ্বায়ুবশিষ্ট-মুগৈঃ কিরাতৈরসেবাতে ভিন্ন শিখণ্ডি-বহঃ।

বঙ্গাব্দ : শিশির কুমার দাস

ভগীরথ নির্ঝরের জলকণায় ভরা বাতাসে মুহুর্মুহু কাঁপছে দেবদারু গাছের পাতা, কিরাতেরা খুঁজছে তাদের শিকার। ঐ ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে তাদের গায়ে, আর ঐ ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ময়ুয়ের পেথম।

হিমালয় বর্ণনার পাশাপাশি বসন্ত ঋতুর বর্ণনাও অপরূপ। দেবতাদের চক্রান্ত যেদিন পর্বতে অকাল বসন্তের আগমণ হয় সেদিন প্রকৃতি তার সমস্ত রূপ সৌন্দর্য ও মাদকতা নিয়ে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হন। একদিকে শিবের শান্ত অথচ গম্ভীর ধ্যানমগ্ন তপশ্চর্যা-কাম-বৈরাগ্য, ভোগ-ত্যাগ, উজ্জ্বলতা-সংযমে অপরূপতা পূর্ণ— অন্যদিকে প্রকৃতির সাজো-সাজোরূপ—ফুলে ফুলে মত্ততা ও মায়াবী আহ্বানের মেলবন্ধন।

তৃতীয় সর্গে সব থেকে নাটকীয় ও আবেগ তাড়িত অধ্যায়। এ সর্গে কামনাও বৈরাগ্যের সংগ্রামে জয়ী হয়েছে বৈরাগ্য সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে নতুন সংগ্রাম। এ সংগ্রাম তপস্বী শিবের সঙ্গে তপস্বিনী উমার। শেষ পর্যন্ত উমার তপস্যার কাছে পরাজয়ের স্বীকার করেছে। শিব, সাধনার বেগ যে কত গভীর শক্তিশালী হতে পারে মহাদেবকে জয় করে তপস্বিনী। উমা তা প্রমাণ করেছেন। এ ভাবেই

চিত্রময়তা ও নাটকীয় উপস্থাপনের মাধ্যমে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ অনবদ্য, শিল্পমুধুময় লাভ করেছে।

রঘুবংশম

মহাকবি কালিদাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কিন্তু কি বিশালতা ও সমুন্নতির কারণে এই গ্রন্থটি মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন—সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। সর্বোপরি দন্দী মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সে নির্দেশানুসারে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যচিত্ত একটি মহকাব্যে।

উৎস

রঘুমবংশম কাব্যে মোট উনিশটি সর্গ। কাহিনী উৎস রামায়ণ, থেকে কাহনী গ্রহণ করলেও মহাকবি রামায়ণের হুবহু অনুসরণ করেন নি। মৌলিকতার ছাপ কবিকাব্যে স্পষ্ট। প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জন করেছেন। রঘুবংশের রাজাদের যে ক্রমে সাজানো হয়েছে তার সঙেগ রামায়ণের যত না মেল, তার থেকে বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের সাযুয্য অনেক বেশি।

কাহিনীসার

রঘুবংশম এ মহাকবি কালিদাস দিলীপ থেকে অগ্নিকা পর্যন্ত রঘুবংশের সাতাশজন রাজার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

সূর্যবংশের বৈবস্বতমনুর গোত্রে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন। এই অপুত্রক পুত্র কামনায় পত্নী সুদক্ষিণাকে সঙেগ নিয়ে কুলক্করু বশিষ্ঠ্যের আশ্রমে যান। রাজার দুঃখ নিবারণ করার জন্য বশিষ্ঠ্য মুনি তাদের গাভী নন্দিনীকে সেবায় তুস্টকরতে বললেন। গাভীর ছিল দেবী মহিমার অধিকারিণী। একদিন এক সিংহ গাভীটিকে আক্রমণ করে, রাজা দিলীপ সিংহটিকে জানায় যে সে গাভীটির প্রাণ স্বেচ্ছায় দিতে পারে—এই বলে সে গাভী পরিবর্তে নিজেকেই সিংহের খাদ্য রূপে উপঢোকন করতে চান। রাজার আত্মত্যাগ ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ। হন ছদ্মবেশী সিংহ। আসলে দেবীমহিমার অধিকারিণী নন্দিনী গাভীটি রাজাকে পরীক্ষা করছিলেন। আত্মত্যাগের পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হলে নন্দিনী বর দিলেন রাজাকে। নন্দিনীর বরে সুদক্ষিণা গর্ভবর্তী হন এবং রঘু নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। রঘু যুবরাজে অভিষিক্ত হলে রাজ্য শতাশ্বমেঘ যজ্ঞ করতে থাকলেন। ভীত ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব চুরি করে। যজ্ঞ পণ্ড করে নিতে উলো হলে রঘুকে যুদ্ধে পরাজিত করে অর্থ উদ্ধার করলেন। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপন হবে এবং পুত্রের হা রাজ্যভার তুলে দিয়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করলেন।

অতপর রঘু দিখিয়ে বের হলেন পূর্বদিকে মুগ্ধ বাহু ইত্যাদি প্রদেশ জয় করে স্যাটি হয়ে 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞ' করে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তিনি কৌৎস মুনির বরে নিজের অনুরূপ লাভ করেন। নাম রাখা হয় ।

চতুর্থ সর্গ ব্যাপী অঙ্কের কথা বর্ণিত হয়েছে অজের বিবাহপর্ব অনুষ্ঠানে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভা বর্ণনায় সেকালের ভারতবর্ষের জীবন্ত ছবি ফুটে উঠছে। এই শাসন, পুর দশরথের জন্ম, পত্নী ইমুমতীর আকস্মিক মৃত্যুর বিলাপ এবং পুত্র দশরথের হাতে রাজা সমার্পণ করে বর্ণিত।

পরবর্তী চারটি সঙ্গে দশরথের রাজ্য থেকে রামচন্দ্রের সীতা উব্দার পর্যন্ত বর্ণিত। এই পর্বে রাজাশাসন, সীতার বনবাস, লবকুশের কাহিনী, লক্ষ্মণ ত্যাগ এবং রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান বর্ণিত হয়েছে।

যোড়শ সর্গে কুশের রাজাশাসন, তার রাজাপাঠ ফিরিয়ে আনার বর্ণনাতে পূর্ণ। পরবর্তী মর্গে ক্রুশের পুত্র অতিথির কানা আছে। অর্ধশদ সর্থে কালিদাস পর্যায়ক্রমে একুশজনে বাজার কাহিনী অতি সংক্ষেণে বর্ণিত হলের য্রাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ঊনবিংশ অধ্যায় এ কাব্যের সর্বাপেক্ষা করুণতম অংশ। অগ্নি থিসকে অবলম্বন করে রঘুবংশের চরম অবনতি বর্ণিত হয়েছে। অগ্নি মিত্রকে অবলম্বন করে রঘুবংশের চরম অবনতি বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য অংশে। অগ্নি মিত্রের কমোসও জীবন উক্তম বিলাসের ডিজ, সচিব অমাত্যর ওপর নির্ভরশীলতা রাজ্যকেই জাহীন করে তুলেছে। অগ্নিমিত্র ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে গর্ভবর্তী রাজ্যপাটের দায়িত্ব পালন করেন। এখানেই রঘুবংশ শেষ।

মূল্যায়ন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাকবি কালিদাস রচিত মহাকাব্যটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সবংশে উৎকৃষ্ট কিন্তু তাহলেও বহু পন্ডিতের মতে নায়কত্ব না থাকায় এবং বস ঐক্য না ঘটায় এ কাব্যের প্রতিটি সর্গ রসাত্মক এ অনন্য হলেও সামগ্রিক ঐক্য সম্পাদিত হয়নি।

ঐক্য সম্পাদিত না হলেও কুমারসঋণের তুলনায় এই কাব্যের মহাকাব্যিক মহিমা, গাম্ভীর্য অনেক বেশি। রঘুবংশের একাধিক রাজার বাহিনী পর্যায়ক্রমে আলোচিত করে মহাকবি পরিবর্তনশীল জীবনের প্রবহমানতাকে কাহিনী কানাতে তাসদিক করে তুলেছেন। অবশ্য ঠিক ‘কুমারসম্ভব’ এর মত এ কারাকাহিনীর জীবনরসের আচুর্য নেই, কিন্তু যা আছে তা জীবনরসের মহৎ দিতেই নির্দেশ করে প্রেম প্রীতি-ভাংলাবাসা, ত্যাগ তিতিক্ষা, শৌর্য-বীর্য কর্তব্যপরায়ন এসব কিছু এক অনন্য একক স্থানাদর্শকেই চিহ্নিত করে। রঘুবংশে মহাকবি মূলত হিন্দুধর্মের আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু যেখানে এই আদর্শ মান্য হয়নি সেখানেই কবি কাহিনীটি সমাপ্তি করেছেন।

রঘুবংশ সাহিত্য রূপভেদে কারা হলেও এ কালো ইতিহাস ও ভূগোলের সমীরণ করেছে। সে সময়কার ভূ-প্রকৃতি জীব প্রকৃতি-মানব প্রকৃতির পরিচয় যতটা খাটি ভাবে পাওয়া যায় তা আধুনিক পন্ডিতে ইহা পাওয়া যায় না। করে ভৌগলিক সাংস্কৃতিক পরিচ এর পাঠ আমাদের বিশেষ সাহায্য করে।

‘কুমারসম্ভব’ কালিদাস মুখ্যত হিমালয় বর্ণনা করেছেন কিন্তু রঘুবংশ-এ কবি সমগ্র ভারতবর্ষের ছবি অঙ্কন করেছেন। এই কাব্যের প্রতিটি সর্গই ঘটনা বৈচিত্রে অভিনব ও আকর্ষণীয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ, নদী-গিরি-নগরীর রূপচিত্রিতি এই মহাকাব্যে চিত্রিত হয়েছে। রঘুর দিগ্বিজয়ে বর্ণনায় এবং ইদুমতীর স্বয়ংখ্যা সভার আলেখ্য চিত্রনসবে মহাধর বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। রাবণ বধের পর হ প্রতাবর্ধনকালে বামচন্দ্র যখন পুস্প তা থেকে সীতাকে যে ভৌগোলিক চিত্রমালা দেখিলে তা ভারতবাসীর অন্তরে এবং গভীর ঐকা বেধের সঞ্চার করে। এখানে কবি দক্ষিণ থেকে অসোনা পর্যন্ত এক দণ্ডের পর্বত, এসব কিছুই কালিদাস এ কাবে বথার্থভাবে কারন

করেছেন। বোধ করি এ কারণেই অবশে সমালোচক সুশীল কুমার দে মন্তব্য করেছেন; "It is rather gallery of picttees than a unified poem " অপদাদিকে ড. সুকুমার সেন বলেন ''এই বর্ণনার সহে নেঘনুষের মেঘের গতিপথ জুড়িয়ে দিলে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে পরনা ভৌগোলিক বর্ণনা পাই।''

এই মহাকাব্যের ষষ্ট সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর কাবাদৌন্দর্য অতুলনীয়। চতু স্বর্গের সহ পরিত্যাগ অংশটি করুণরসের বিহ্বলতায় সকলকে আবিস্ষ্ট করে। ফলকথা ব্যাপ্তিও গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে এই মহাকাব্যে ভোগ নয়, ভাগেই হল ও মাধুর্যের উৎস কালিদাসের এই জীবনদর্শনও এখানে তন্নিবা হয়েছে। ভোগাসক্ত অগ্নিবর্গের পতন কাহিনীর মধ্যে কবি সেই চরম সত্যটি প্রকাশ করেন।

রঘুবংশে মহাকবির প্রমানের পরিচয়ও বিকৃত সংস্কার লোকাচারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছে। মধ্যে শুভ-ইঙ্গিত বহন করে রানের ডান হাত স্পন্দনের মধ্যে এই শুভ দিবই প্রতিফলিত। রাবণের পরাজয়ের মধ্যে অসুভ শক্তির পরজ্ঞা সমাজজীবনের শুভম দিককেই নির্দেশ করে।

রামচন্দ্রের পাশাপাশি সীতার ডান চোখ কম্পিত হওয়ার মধ্যে অমঙ্গলকেই নির্দেশ হা হয়েছে। সন্তান জন্মের পর জাতকর্মাদি সংস্কার সাধনের রীতি সপ্তান যৌবন পর্বে পদার্পন করলে বেশান নিয়ম নীতি অনুষ্ঠান করে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা প্রভৃতি নানান সংস্কার লোকাচার প্রভায় এসবই যথাযথ ভাবে বর্ণিত হয়েছে রঘুবংশে।

সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষায় মহাকবি কুমার-সম্ভব কাব্যের চেনা করেছেন। সাধারণ মানুষের কোমল বস্তুর নিকক্তলিকেই কালিদাস কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কাব্যে অলংকারের পাশাপাশি কবি শব্দালংকারের ব্যবস্থারও করছেন সমান দক্ষতায় উপমা প্রয়োগে কালিদাসের অসামান্য কবিকে 'উপমা কালিদাসস্য'-এ ভূষিত করেছেন। বর্ণনা কুশলতা, ছন্দ অলংকারের যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি কবির ইতিহাস-ভূগোল রাজনীতি ধর্মীয়বোধ লোকাচার-লোকসংস্কার সব কিছুই কাব্যটিকেই পরিপুষ্ট দান করেছে।

গীতিকাব্য : মেঘদূত

মহাকাব্য নাটকের পাশাপাশি মহাকবি গীতিকাব্য রচনাতেও সমান দক্ষ। শ্রেষ্ঠ গীতিকবির মতো কবিও 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে কবির ব্যক্তিমনের ভাব উজ্জ্বল প্রকাশ পেয়েছে। মহাকবি সংস্কৃত সাহিত্য জগতকে দুটি গীতিকাব্য উপহার দিয়েছেন– ঋতুসংহার এবং মেঘদূত। প্রথমটি কবির তরুণ বয়সের আর দ্বিতীয়টি পরিণত বয়সের রচনা।

মেঘদূত কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। এ কাব্যের যথার্থ উৎস কি সে সম্পর্কে সমালোচকমহলে বাকবিতণ্ডা আছে। ভারতীয় সাহিত্যে বর্ষাকালের দূরতরূপে মেঘের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। ঋগবেদ-এ। টাকাকার মল্লিনাথের মতে মেঘদূতের উৎস রামায়ণের সীতার কাছে রাম কর্তৃক হনুমানকে দূতরূপে প্রেরণের ঘটনা। উল্লেখ্য মেঘদূতের কাহিনী পরিকল্পনার সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় প্রাচীন চৈনিক কবিতার। আনুমানিক ২৭৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে রচিত কবিতাটিতে মেঘেকে প্রেমের দূত রূপে প্রেরণ করা হয়েছে :

O floating clouds that swim in the
heaven above/Bear on your wings
these words to hin I love.

কিছু সমালোচকের মতে চিনাভাষায় রচিত এই কবিতাটিই মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত রচনার উৎস স্থল। কিন্তু এ মত গ্রহণ যোগ্য নয়, কারণ, কালিদাস চিন ভাষা জানতেন না। উৎস যাই হোক না কেন– মেঘকে দূত করে এরূপ কোনো কাব্য শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যের আসরেও মেঘদূত বিশেষ সমাদৃত।

মহাকবি কালিদাসের সব থেকে সমাদৃত কাব্য ''মেঘদূতম" সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র নির্দেশে এটি একটি খণ্ড কাব্য, আধুনিক বিচারে লিরিক ধর্মী কাব্য। কালিদাসের কবি কল্পনা এখানে বস্তু ভারহীন, আধ্যাত্মভাবনা শূন্য আত্মভাবনায় মগ্ন। এ কাব্যে যতটা না কাহিনী তার থেকে বেশি কবি কল্পনার আলেখ্য কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। প্রতিটি চরণে ২৭টি করে অক্ষর। এবং প্রতি চার চরণে এক-একটি শ্লোক সমাপ্ত। সমগ্র কাব্যে মোট ১২৮টি শ্লোক আছে। কাব্যের দুটি অংশ : পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ। পূর্বমেঘের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে কবি নায়ক বিরহী যক্ষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর বাকি ১২৩ শ্লোকই মেঘের প্রতি তাঁর উক্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বমেঘে কাহিনী সূচনা এবং উত্তর মেঘে সমাপ্তি।

পূর্বমেঘ

অলকাধিপতি কুবের ভৃত্য ছিলেন কোনো এক যক্ষ। কতর্ব্য শৈথিল্যের জন্য কুবেরের শাপে তাঁকে মৃদু রামগিরি থেকে নির্বাসিত হতে হয়। এক বছরের জন্য। কোনো এক আষাঢ়ের প্রথম দিনে পর্বতের সানুদেশে নবোদিত মেঘকে দেখে বিরহী যক্ষের তৃষিত অন্তর প্রিয়া মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কুবেরের শাপে সশরীরে অলকাপুরীস্থিতি প্রিয়ার কাছে তার যাওয়া সম্ভব নয়।

মেঘ দেখে যজ্ঞ কামার্ত হয়ে চেতন অব-চেতন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। প্রিয়ার সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য মেঘখণ্ডের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান তিনি। এরপর মেঘ চলেছে তার বার্তা নিয়ে নে উড়ে চলেছে যক্ষের কল্পনা। এরপরই তার যাত্রাপথে চিত্রের পর চিত্র।

যক্ষের নির্দেশ মতো এঁকে-বেঁকে মেঘ পৌঁছাবে আম্রকূট পর্বতে। সেখানে কিছুটা বর্ষা। করে লঘুভাব মেঘ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। এরপর বিন্ধ্যপর্বতের পাশে বিশীনা রেবানদীর বুকে জল ঢেলে, রেবার জলপান করে বক্টগ্রাম জনপদ অতিক্রম করে দর্শানদেশের রাজধানী বিদিশায় উপনীত হবে। সেখানে ক্লান্ত শ্রান্ত মেঘ বেত্রবতী নদীর জল পান করে পাহাড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার তার যাত্রা্রু করবে। এই যাত্রাপথে যক্ষের অনুরোধে মেঘ একটু ঘরে উজ্জয়িনীকে স্পর্শ করে যাবে। এই যাত্রাপথেই পড়বে নিবন্ধ্যা সিন্ধু নদী যা অতিক্রম করেই পরবে অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর শীতল বাতাসে স্নিগ্ধ হয়ে মেঘ গন্ধবতী তীরে মহাকাল মন্দিরে যাবে, সেখানে দেব-দাসীরা নৃত্য করে। উজ্জয়িনীর পথে পথে চলে অভিসারিকারা। এইসব দেখার পর মেঘ আবার চলতে শুরু করে, এই চলার পথে পরে গম্ভীরা এবং চর্মবতী নদী। এইসবই অতিক্রম করে অতিক্রম করবে দশপুর

নগর। ব্রাহ্মবর্ত দেশ, সরস্বতী নদী, কনখল, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। এর পরেই কৈলাস পর্বত। সেখানেই আছে মানস সরোবর আর তার তীরে আছে তার সকল কামনার মোক্ষধাম–অলকাপুরী। পূর্বমেঘের যাত্রাপথের বিবরণ এই পর্যন্তই।

উত্তরমেঘ

সুরম্য অলকাপুরী, যক্ষের গৃহের বিচিত্র বর্ণনা, যক্ষ প্রিয়ার রূপলাবণ্যের কথা, যক্ষের প্রেরিত বার্তা, এসব বিবরণেই উত্তরমেঘের রূপচিত্র পরিপূর্ণ। এ সকল বিবরণের মধ্যে মূল অভিকর্ষ হল যক্ষ প্রিয়া। এখানে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে যক্ষ প্রিয়ার দেহ সৌন্দর্যের উপকরণ রূপেই। যক্ষপ্রিয়া বিধাতার প্রথম সৃষ্টি।

তন্বী শ্যামা শিখবিদশনা পৰবিম্বাধরোহী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি।
শ্রোণীভাবাদলম গমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিবাদ্যৈব ধাতু ঃ।

(শ্লোক নং - ৮৫)

অনুবাদ :

তন্বী শ্যামা আর সূক্ষ্মদন্তিনী নিম্ননাভি ক্ষীণ মধ্যা, জঘন শুরু বলে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি, অধর রক্তিমা পকবিম্বের যুগল স্তনভাবে ঈষদনতা, সেথায় আছে সেই, বিশ্বস্রষ্ঠার প্রথম যুবতী প্রতিমা। (বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ)

এই যক্ষপ্রিয়ার কাছেই পৌঁছাতে হবে মেঘকে। তাকে জানাবে–‘শেষাল্, মাসাল্ সময় চতুরোলোচনে মীল-রিত্বা।’ অর্থাৎ এই শেষ চার মাস চোখ খুঁজে, অতিবাহিত কর, বৎসর শেষে তোমার দয়িত ফিরে আনবেন। প্রভু শাপ মুক্ত হয়ে। প্রিয়ার প্রতি এই সংবাদ নিবেদন করে যক্ষ মেঘকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার কাজটুকু করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন:

এতৎ কৃত্বা পপিয়মনুচিত প্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহাদাদ বা বিধুর ইতি বা ময়ানুক্রোশ বুদ্ধ্যা,
ইষ্ঠান দেশান জলদ বিচর প্রাবৃষা সংস্কৃতশীব্
মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুৎ বিপ্রযোগঃ।

অর্থাৎ

‘অনুচিত প্রার্থনাকারী আমার এই প্রিয় কাজটুকু সৌহার্দ্যের জন্য হোক বিরহি বলেই অনুকম্পার বশেই হোক করে দিয়ে, হে মেঘ তুমি বর্ষা শ্রীসম্ভব লিখে ইচ্ছামত দেশে বিচরণ কর।’ ‘বিদ্যুৎ বিচ্ছেদ জীবন না ঘটুক’– বন্ধু, বন্ধুর আশিষ লও।” (যক্ষের নিবেদন/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কাব্য সঞ্চয়ন)

মেঘদূত কাব্যের শেষ এখানেই। অবশ্য কোনো কোনো সংস্করণে এর পরেও একটি শ্লোক পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত কালিদাস গ্রন্থাবলীর মেঘদূত অংশে উল্লেখ আছে ‘‘মেঘকথিত এই

সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া ধনপতি কুবেরের কোপ শান্তি হইল। তিনি সদয়চিত্তে তৎক্ষণাৎ শাপমোচন করিয়া ছিলেন। তখন যক্ষ দম্পতি পুনর্মিলিত হইয়া অশোকচিত্তে পুলকিত মনে নিবস্তর সুখসম্ভোগে নিরত রহিলেন।"

মূল্যায়ন

শুধু ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস বিশেষত গীতিকবিতা বা বলা ভালো প্রেম বিষয়ক কবিতার ইতিহাসে 'মেঘদূত'-র মত কাব্য নেই বললেই চলে। আত্মভাবনাময় এমন অপূর্ব গীতিকাব্য সত্যই বিরল। খন্ড কবিতা হয়েও মেঘদূত অখন্ড। মেঘদূত কাব্যের বিষয়গত প্রকরণ পরবর্তী কবিকূলকে এতই অভিভূত করেছিল যে সংস্কৃত সাহিত্যে দূত কাব্যের একটি প্রকৃষ্ট ধারাই গড়ে ওঠে। যেমন: ধোয়ীর পবনদূত (১২শ শতক) রূপ গোস্বামীর 'হংশদূত' (১৬শ শতক) কৃষ্ণানন্দের 'পদাধীক দূত' (১৭শ শতক) প্রভৃতি। কাব্যটির জনপ্রিয়তার কারণে এর একাধিক টাকা ভাষ্যও রচিত হয়। এই সমস্ত টাকাগুলিতে মেঘদূতের শ্লোক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। কারও মতে কাব্যটির শ্লোকসংখ্যা ১৩০ অবশ্য মল্লিনাথ মহাশয় গ্রন্থটির টাকা রচনা করতে গিয়ে ১১১টি শ্লোককে গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, নানামত থাকলেও আমরা মনে করি কাব্যটিতে কমপক্ষে ১০৮টি শ্লোক ছিল।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কাব্যটি অনূদিত হওয়ার পাশাপাশি ইংরাজী, জার্মান, সিংহলী, তিব্বতী ভাষাতেও কাব্যটি অনূদিত হয়। আদি বমাত্মক একখানি কাব্যের এমন সমাদরের দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল। মহাকবি গেটে উইলসনকৃত 'মেঘদূত অনুবাদ পাঠে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তার প্রশংসা করে একটি কবিতা রচনা করেন।

What more joyous could we wisk to know!
Sakontala Nala– these we imust kiss;
And Mega-Duta, The clowd-Messenger,
Who would not send him to kindred souls."

[A History of Indian Lit. (vol-III) Winternitz]

সংস্কৃত-৬

এ কাব্যটিতে প্রকৃতি বা পথের পরিচয় মুখ্য নয়, মুখা বিরহ-যক্ষপ্রিয়া। উত্তর মেয়ে প্রকৃতিকে যেখানে যতটুকু পাই তা নারীর দেহসজ্জার উপকরণ স্বরূপ।

শ্যামসং চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাত
বক্তংচ্ছায়াং শদিন শিখিনাৎ বক্টভারেষু কৌশন্
উৎপশ্যামি প্রতষু নদীবীচি বিলাসান্
হস্তে কশ্মিন কচিদপি নতে চন্ডি স্যামন্তি।

শ্লোক: ১০৭ নং

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ

দেখি প্রিয়ঙ্গুতে তোমার তনুলতা, পদন বিস্মিত চলে, ময়ূর পুচ্ছের পুঞ্জে বেশভার চকিত হরিণীতে ঈষণ মীর্ণ তটিনীর ঢেউয়ের ভঙ্গিতে ভুরুর বিললিত পতাকা কিন্তু হায়, নেই তোমার উপমান কোথাও একযোগে চণ্ডী।

ফলকথা কালিদাসের এ কাব্যে প্রেমচেতনা ও প্রকৃতি চেতনা একত্রে মিলে মিশে একাকার হয়েছে। প্রকৃতির রূপ চিত্রলে তৎকালীন ভারতীয় জনপদ, গ্রাম, নদ-নদী, অরণ্য প্রস্তর পর্বত, মেঘের যাত্রাপথ, ভৌগোলিক মৌসুমী বায়ুর যাত্রাপথ বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আমরা পক্ষ করি। কালিদাসের প্রতিভাশক্তি একটা ভৌগোলিক তত্ত্বকে শাশ্বতিক মানবিক অনুভূতির প্রেক্ষিতে আবেগ তাড়িত উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের আরও নিগূঢ় সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন পৃথিবীর বাহুর মধ্য দিয়ে সুখের যাত্রার শেষে স্বর্গলোকে একের মধ্যে এই অভিসারের মাত্রা ও পরিণাম।

> ‘নববর্ষার দিনে এই বিষয় কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রচুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্ব মেঘের গান, এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয় তাহাই উত্তর মেঘের সংবাদ, সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ আছে। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়।’

এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে এ বিরহ যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহ নয়, এ বিরহ অতীতের নয়, বর্তমানেরও। এ বিরহ দেশের সর্বকালের সর্বমানবের। যার সঙ্গে আমরা মিলিত হতে চাই তাকে আমরা পাই না। তার সঙ্গে থাকে দূর-দূরান্তের বিরহ সে তো বাস করে মানস-সরোবরের তীরে যেখানে কল্পনার মেঘকেই দূত করে পাঠাতে হয়, সশরীরে পৌঁছানো যায় না।

> ‘নববর্ষা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তর মেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহ্নর মধ্যে দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম। নববর্ষার দিনে বিষয় কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কেনা বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান, এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তর মেঘের সংবাদ। সকল কবির কাব্যেই এই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে।’

ব্যক্তিগত প্রেমকে সমষ্টি প্রেমে উন্নিত করতে পারলেই প্রেমের ব্যপ্তি ঘটে। আমরা আমাদের বিচ্ছিন্নতাকে কখনোই ব্যক্তিগত প্রেমের সূত্রে জয় করতে পারি না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘মেঘদূত’-এর সৌন্দর্য ও কবিত্বতে মুগ্ধ হয়ে উত্তরমেঘ সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> ‘অলকা এক নূতন সৃষ্টি। এত বড় ভারতবর্ষটা ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। ...তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতম শৃঙ্গে মনুষ্যের অগম্য কেবল তাঁহার কল্পনামাত্র গম্যস্থানে অলকানগর বসাইলেন। ...কালিদাস মেঘদূতে... অনন্দময়, সুখময়, প্রেমময় সংসার সৃষ্টি

করিয়া গিয়াছেন।”

আবার ভাষাবিদ ড. বামেশ্বর×শ বলেন

‘কালিদাসের যুগ ভারতের নগরগুলিতেও আধুনিক নগরের যন্ত্রণা, কর্মের ব্যস্ততা ও জটিল বিকৃতি ছিল না। নগরেও ছিল শান্তি, মাধুর্য এবং প্রকৃতির অলক্ষে স্নেহালালন।’

আসলে জগৎ ও জীবনের সব রকম কুশ্রীতাকে বর্জন করে কালিদাসের দৃষ্টি সবকিছুকেই সুন্দর করে তুলেছে।

সমুদ্র মেঘদূত কাব্যে সংক্ষিপ্ত বাক্‌বিন্যাস, বর্ণনায় বিষয় বৈচিত্র, অনুভূতির গভীরতা, হৃদয় বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করার অমোঘ শক্তি কাব্যটিকে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণের সীতা বিরহে রামচন্দ্রের সমবেদনাই কালিদাসকে যক্ষের বিরহের কথা মনে করিয়ে দেয়। কালিদাসের বাগ বৈদগ্ধের তুলনা নেই। মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত এ কাব্যটিতে মহাকবি শৃঙ্গার রসের ভাবৈশ্বর্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন। কালিদাস জীবনরসিক; স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাব্যে দেহজ সৌন্দর্য বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। মানব-মানবীর প্রেমানুরাগ আকুতিভরা বিরহকাব্যরূপে মহকবি কালিদাসের ‘মেঘদূত’ এক চিরন্তন সংগীত– যা বিশ্বাসাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ঋতুসংহার

ঋতুসংহার একটি গীতিকাব্য। হয় সর্গে ১৫৩টি শ্লোকে রচিত এ কাব্যটি মহাকবি কালিদাসের অপরিণত রচনা। পণ্ডিত মহলে এ কাব্যটি কালিদাসের রচনা কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। কেননা এ কাব্যে কবির বাগবৈদগ্যের পরিচয় নেই বললেই চলে। এতে ছন্দের ভ্রান্তি এবং যাতপতনী ইত্যাদি দোষ দেখা যায়। টাকাকার মল্লিনাথ এ কাব্যের কোনো টীকা রচনা করেন নি। এ সব কারণে কিছু পণ্ডিত এ কাব্যটি কালিদাসের রচনা বলে গ্রহণ করতে চান নি।

কিন্তু বেশির ভাগ বিদেশী পণ্ডিত ঋতুসংহারকে কালিদাসেরই কাব্য বলে দাবী করেছেন। কীথ সাহেব নিজের গ্রন্থে কালিদাসের এ রচনাকে অপরিণত রচনা বলে ঘোষণা করেছেন। এ কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কাব্যে বর্ষ বর্ণনা হয়েছে গ্রীষ্ম দিয়ে।

প্রাচীন কালে বসন্তই ছিল ঋতুরাজ, স্বাভাবিক ভাবেই এই ঋতুরাজ বর্ণনা দিয়েই কাব্যারু বিধেয় ছিল। এরূপ বিভিন্ন কিন্তু, যদিও বিষয় থকালে অধ্যাপক কীল হর্ণ ম্যাক ডোলেন, শ্লোয়োডার কীথ প্রমুখের মতে যেহেতু Mandassor থাবা লিপিতে এ কাব্যের দুটি শ্লোক অনুকৃত হয়েছে তাই কাব্যটির প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। তা ছাড়া কালীদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় এই ঋতুসংহার কাব্যটি অনেক বেশি সহজবোধ্য;তাই স্বাভাবিক ভাবেই মল্লিনাথ এর টাকা রচনা প্রয়োজন মনে করেন নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পূর্বভারতের জ্যোতির্বিদগণ গ্রীষ্ম থেকে বর্ষার করতেন। বোধ করি এ কারণেই Keith সাহেবের সুস্পষ্ট অভিমত :

"In point of fact the Ritusamhera is far from unworthly of Kalidasa and if the poem were denied him his reputation will suffer real loss."

History of Sanskrit Literature

এই সঙ্গে তিনি একমতও পোষণ করেছেন–এ কাব্যটি কবির অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সের কাঁচা রচনা। তাই এতে পরবর্তী কাব্যের পরিপূর্ণতা বা রচনা শক্তি নৈপুন্য প্রত্যাশা করা যায় না কিন্তু কালীদাসের স্টাইলের পূর্বাভাস এ কাব্যেও স্পষ্ট।

ঋতুসংহার কাব্যে ছয় ঋতুর প্রকৃতির রূপ বর্ণনা বা থাকলেও প্রকৃতির রূপচিত্রণ কবির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়, এক একটি ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোরাজ্যে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে , কালিদাস তারই রূপ চিত্রণ করেছেন।

মোট একশো তিপ্পান্নটি শ্লোকে মোট ছ'টি সর্গে কালিদাস এ কাব্যে গ্রীষ্ম-বর্ণা, শরৎ, হেমন্ত শীত ও বসন্ত এই ছটি ঋতুকেই বর্ণনা করেছেন মানুষের মনোরাজ্যের বক্তপরিবর্তন রূপ করে। প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী মনে প্রতিটি ঋতু কিভাবে প্রেমকে জাগিয়ে দেয় তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবির ঋতু বর্ণনায়। ছয় ঋতুর মধ্যে শরৎ নারী রূপে এবং অন্যগুলি পুরুষ রূপে কল্পিত কবি কাহিনী। কবি যেন প্রিয়াকে সম্বোধন করে একে একে অন্যঋতুগুলির বিবরণ দিয়েছেন। ঋতুর বিবরণ দিলেও কবি মানুষের অনুভব দিয়ে প্রকৃতিকে বর্ণনা করেছেন। কবি এখানে প্রেমিক ঋতুরূপের পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তার প্রিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন:

> 'যৌবনাবেশ বিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন জগতে ঋতু আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম জাগানো, ফুল ফুটানো প্রভৃতি সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক।'

নববর্ষা/বিচিত্র প্রবন্ধ, রচনাবলী ৫ম খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে ঋতুসংহার কাব্য বিচারের কয়েকটি মূল সূত্র সহজেই প্রকাশ পেয়েছে।

ষড়ঋতুর সানুপুঙ্খ বর্ণনায় ভরপুর হয়ে আছে ঋতুসংহারের শ্লোকগুলি। তেজদৃপ্ত গ্রীষ্মকালে চন্দ্রমার স্পৃহনীয়তা, নিরন্তন অবগাহণের ফলে পুষ্করিণীর সাললের হ্রাসপ্রাপ্ত দশা, দিনান্তের বর্ণনীয় সৌন্দর্য, শোভাশালী নৃপতির মত বর্ষাকালে মেঘের মত হস্তীরূপ, বজ্রবাদ্য এ সবই বর্ণিত হয়েছে কালিদাসের এ কাব্যে।

কাব্যের সূচনা হয়েছে গ্রীস্মের বর্ণনা দিয়ে

প্রচণ্ড সূর্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষম করি সঞ্চয়ঃ।

দিনান্তর ম্যোহভু পশান্ত মনমথ্যে, নিদাঘ কালো হয় মুপা গতঃ প্রিয়ে॥

গ্রীষ্মকাল সমাগত। সূর্য প্রচন্ড তেজ ধারণ করেছে, চন্দ্রমার দৃশ্যই স্পৃহনীয় হয়, নিরস্তর অবগাহন করায় জলাশয়স্থ জলের হ্রাস হয়েছে দিবা শেষ বমনীয় হয়ে এবং কামাবেগ প্রশান্ত হয়েছে।

কাব্য শেষ হয়েছে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা দিয়ে। এই ঋতু নবীন বর্ষকে পুণরায় জন্মদান করেছে। এরই মাঝে কবি বর্ণনা দিয়েছেন বর্ষার নব মেঘের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলন কামী মানব-মানবীর অন্তরের আকুতি শরতের নির্মল পরিবেশে ভোগের স্নিগ আয়োজন, হেমন্তের পাকা ফসলের সম্ভাবে ধরণীর মানুষজনের উদ্বেলতা, কুয়াশাঘন শীতের মিলনের আকুলতা। রমণীয় বসন্তের রতিবিলাসের বিবিধ আয়োজনের কথা এ ঋতুকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে প্রকৃতি ও প্রেম বর্ণনায় মহা কবি কালিদাস এ কাব্যটিকে শিল্প সুষমায় দান করেছেন।

মূল্যায়ন

ঋতুসংহার একটি খণ্ড কাব্য। মেঘদূতের মত অবশ্য এ কাব্যে সেরূপ গভীরতার ছাপ স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাহলে ষড় ঋতুর যে বর্ণনা কবি এখানে করেছেন তা এককথায় অনন্য অনবদ্য। কবি এখানে লোক প্রসিদ্ধিগুলি ব্যবহার করেছেন, কোনো অলৌকিক বা কল্পনার মায়াজাল বিস্তার করেননি। তবে প্রকৃতির রূপ চিত্রনে অন্যান্য কাব্য বা নাটকে যে চমৎকারিত্ব আছে, এখানে তা বিরল। মাঝে মাঝে বেশ কিছু শ্লোক অবশ্য আকর্ষক হয়েছে।

কাব্যের প্রতিটি শ্লোক স্বতন্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু তা হলে এগুলির সম্মিলিত রূপ যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তা ষড় ঋতুকেই মোহনীয় করে তুলেছে। কালিদাসের যুবাকালে রচিত বলে এ কাব্যে স্বাভাবিক ভাবেই যৌবনের বন্দনা ও জয়গান বিশেষমাত্রা পেয়েছে। যৌবনের বাধাবন্ধনহীন সম্ভোগ ও জরাহীন দুঃখ হীন এক কল্পজগৎই হল এ কাব্যের ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন :

> 'এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলন সঙ্গীত আছে, তাতে স্বরগ্রাম তালের নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে গিয়ে পৌঁছায়নি।'

সহজ সরল সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গী এ কাব্যটির আর একটি উল্লেখনীয় দিক চিহ্ন। এ কাব্যের বিশেষ দুর্বলার দিক এর দুর্বল ছন্দোরীতি ও যতিপতন দোষ। প্রথম বয়সে রচনা বালেই কাব্যে এ রূপ দোষ-ত্রুটি থেকে গেছে। পরিণত কাব্যে রতি ছাপ না থাকলেও চিত্ররচনার অনবদ্য কুশলতা এবং সুপরিশীলিতা বাভঙ্গির উজ্জ্বল নিদর্শন রূপ কাব্যটি আজও বাংলা কাব্য সাহিত্যে স্মরণীয়। 'ঋতুসংহার' যৌথ শব্দ। ঋতুর সংহার। সংহার এর অর্থ সংগ্রহ। অর্থাৎ ঋতুর সংগ্রহ। ষড় ঋতুর সংগ্রহরূপ এ কাব্যটি যথার্থই প্রকৃতি ও মানুষ অর্থাৎ নারী-পুরুষের রূপচিত্র হয়ে উঠেছে-সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩০.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ক) 'কুমারসম্ভব' কাব্যটি কী ধরনের কাব্য?
খ) 'কুমার সম্ভব' কাব্যের সর্গ সংখ্যা ক'টি?
গ) 'কুমার সম্ভব' কাব্যের কাহিনী কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে?
ঘ) 'রঘুবংশ' কী ধরনের কাব্য? সর্গ সংখ্যা কয়টি?
ঙ) 'রঘুবংশ' কাব্যে কতজন রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে?
চ) 'মেঘদূত' কী ধরনের কাব্য?
ছ) 'মেঘদূত' কাব্যের কটি অংশ ও কী কী?
জ) 'পূর্ব মেঘ' অংশে কোথা থেকে কোথাকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে?
ঝ) 'উত্তর মেঘের' যাত্রাপথ কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে?
ঞ) 'ঋতু সংহার' কালিদাসের কী ধরনের কাব্য'? কটি সর্গ রয়েছে?

২। ক) মহাকবিরূপে কালিদাসের অবদান আলোচনা করুন।
খ) 'মেঘদূত' কাব্যের ভাব উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

গ) আধুনিক কাব্যের বিচারে 'মেঘদূত'কে গীতিকাব্য বলা যায় কি? আলোচনা করুন।
ঘ) 'মেঘদূত' কাব্য অবলম্বনে কালিদাসের নিসর্গ চেতনার পরিচয় দিন।
ঙ) 'কুমারসম্ভব' কাব্যের ভাবসৌন্দর্য আলোচনা করুন।
চ) 'রঘুবংশ' কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
ছ) 'ঋতুসংহার' কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩০.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র)–বসুমতী (১০ ম সং-১৩৬০)
২। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ (১ম, সং-১৯৬৫)–বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।
৩। সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস–ড. দেবেশ কুমার আচার্য।
৪। সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাচিত পাঠ–প্রদ্যোত বিশ্বাস
৫। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস–শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৩০.৮ উত্তর সংকেত

১। ক) মহাকাব্য
খ) সপ্তদশ সর্গে রচিত।
গ) রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ বিশেষত শিবপুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে।
ঘ) মহাকাব্য, ঊনিশ সর্গে রচিত।
ঙ) ২৭ জন রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে।
চ) গীতকাব্য।
ছ) দুটি। পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ।
জ) রামগিরি থেকে অলকার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা রয়েছে।
ঝ) 'উত্তরমেঘ' অলকাপুরি থেকে শুরু করে যক্ষের গৃহের বিচিত্র বর্ণনা যক্ষ প্রিয়ার রূপলাবণ্যের কথা, যক্ষের প্রেরিত দিয়ে শেষ হয়েছে।
ঞ) গীতিকাব্য, ছয়সর্গে ১৫৩টি শ্লোকে রচিত হয়েছে।

২। ক) ৩০.৫ অংশ দেখুন।
খ) ৩০.৫.১ এর (গ) অংশ দেখুন।
গ) ৩০.৫.১ এর (গ) অংশ দেখুন।
ঘ) ৩০.৫.১ এর (গ) অংশ দেখুন।
ঙ) ৩০.৫.১ এর (ক) অংশ দেখুন।
চ) ৩০.৫.১ এর (খ) অংশ দেখুন।
ছ) ৩০.৫.১ এর (ঘ) অংশ দেখুন।